অমিতাভ
বুদ্ধ

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

* * *

অমিতাভ বুদ্ধ

নমো তস্‌স ভগবতো
অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্‌স।

* * *

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

নিবেদন

'অমিতাভ' কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের একখানি বিখ্যাত কাব্য। ঊনিশটি সর্গে বিবিধ ছন্দে কবি কাব্যখানি রচনা করেছেন। ভূমিকায় কবি লিখেছেন—"যাঁহার অমিত আভায় সার্ধ দুই সহস্র বৎসর কালবক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে এবং এখনও ইউরোপ আমেরিকা পর্যন্ত যাঁহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সেই বুদ্ধদেব শাক্যসিংহকে আমি নমস্কার করি। তাঁহার অন্যতর নাম অমিতাভ।"

"………প্রায় সকলেই বুদ্ধদেবকে অল্পাধিক অতিমানুষিক-ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে যথাসাধ্য মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতিলাভ করে, তাঁহাদিগকে অধিক আপনার বলিয়া বোধ হয়।"

এই কারণেই অমিতাভ কাব্য—বুদ্ধদেবের অন্যান্য জীবনী-গ্রন্থ থেকে খানিকটা বিশিষ্ট। "অমিতাভ বুদ্ধ" গ্রন্থে কয়েকটি স্থান ছাড়া মোটামুটি অমিতাভ কাব্যকেই অনুসরণ করা হয়েছে। কবি নবীনচন্দ্রের নিকট যে লেখকের ঋণ ষোল আনা এই প্রসঙ্গে আবার তা স্বীকার করছি।

বুদ্ধ পূর্ণিমা
১৩৬৩ } গ্রন্থকার

অমিতাভ বুদ্ধ

করুণাঘন বুদ্ধ

অমিতাভ বুদ্ধ

…ভগবান কথা দিয়েছেন…'যখন ধর্ম পদদলিত হবে—অধর্ম দাঁড়াবে মাথা উঁচু করে, তখন দেহ ধারণ করব আমি, অবতরণ করব…ধর্মকে রক্ষা করতে, প্রতিষ্ঠা করতে—বারে বারে, যুগে যুগে, রূপে রূপে আসব আমি, আমি আসব আসব।'

* * *

খুব ছোট নগর কপিলবস্তু। খুব ছোট, কিন্তু খুব সুন্দর। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়ের প্রাচীর। উত্তরে হিমালয়, তুষার-মৌলি নগাধিরাজের অটল গাম্ভীর্য, পশ্চিমে পার্বত্য নদী রোহিণী আর তার ওপারে নৈমিষারণ্য—প্রাচীন ভারতের মহিমান্বিত তপোবন, দক্ষিণে গর্বস্ফীত কোশল, পূর্বে উদীয়মান মগধ।

কপিলবস্তু শাক্যদের রাজধানী। শাক্যরা শান্তিপ্রিয়। কৃষি-কার্য আর পশুপালন—এই দুটি ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। যুদ্ধ তারা করত, করতে হ'লে করত, খুসি হ'য়ে করত না।

আজ থেকে প্রায় দু' হাজার ছয়শ' বছর আগের কথা। কপিলবস্তুতে তখন রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। নম্র, শান্ত, উদার রাজা। তাঁর দুই রাণী—মহামায়া আর মহাপ্রজাবতী। মহাপ্রজাবতীর আর এক নাম ছিল গৌতমী। দুই রাণী দুই

সহোদরা বোন। কপিলবস্তুর পূর্বে কলি রাজ্য। কলি রাজ্যের রাজধানী দেবদহ। এই দেবদহের অধিপতি অনুশাক্যের দুই কন্যা মহামায়া আর মহাপ্রজাবতী।

শুদ্ধোদনের ঐশ্বর্য ছিল, আরাম ছিল; কিন্তু মনে সুখ ছিল না, শান্তি ছিল না। কারণ—

"পুত্রহীন শুদ্ধোদন মায়াময়ী মহামায়া
পুণ্যবতী প্রজাবতী তথা,—
উভয়ের শূন্য অঙ্ক, পুষ্পহীন পুষ্পপাত্র,
সুধাহীন সুধাকর যথা।"

কোন পুত্র হল না তাঁর। রাজভোগে কি হৃদয়ের ক্ষুধা, স্নেহের পিপাসা মেটে? কি হবে এই রাজত্ব দিয়ে? আর তাঁর মৃত্যুর পর রাজত্বের-ই বা হবে কি? রাজা ভাবেন, ভেবে ভেবে আরও বৃদ্ধ হ'লেন। রাণীরা ভাবেন, পূজা করেন, মানত করেন, মিনতি করেন—হে ভগবান, সদয় হও।

আড়াই হাজার আশি বছর আগের কথা।

কপিলবস্তুতে দক্ষিণায়ন উৎসবের সময় এল। এরই নাম বসন্তোৎসব। শাক্যজাতির খুব বড় উৎসব এটা। দুঃখ কষ্ট ভুলে রাজারাণী সকলে উৎসবে মত্ত হ'য়ে উঠলেন। কেবল নাচ, কেবল গান, কেবল আনন্দ। সাতদিন উৎসব চলে। সপ্তমদিনে ভোরে উঠে রাণী মহামায়া স্নান করলেন, নীলাম্বরী শাড়ি পরলেন, প্রসাধন করে, ফুলের গহনা গায়ে দিয়ে চললেন উৎসব মণ্ডপের দিকে। কিন্তু ছয়দিনের রাত্রি-জাগরণের

ক্লান্তি তাঁর চোখে, দেহে, মনে। রাণী মণ্ডপে এসে তাঁর অবসন্ন দেহ পালঙ্কে এলিয়ে দিলেন। ঘুম এল তাঁর দুই চোখে।

স্বপ্ন দেখলেন রাণী……

চারজন স্বর্গের দূত তাঁর শয্যা বহন করে আকাশে উঠ্‌ল। উড়তে উড়তে তারা হিমালয়ের শৃঙ্গে গিয়ে এক বিরাট বৃক্ষ-তলে নামাল শয্যাটি। স্বর্গের দেবীরা এসে রাণীকে নামিয়ে সুবাসিত জলে স্নান করিয়ে, পুষ্পগন্ধে সজ্জিত করে এক শাল বৃক্ষের নীচে সুবর্ণ পর্যঙ্কে এনে শুইয়ে দিল। রাণী দেখলেন তুষার-ধবল এক সুন্দর হস্তী, শুঁড়ে একটা শ্বেতপদ্ম জড়িয়ে ছুটে এল। মাথা নত করে তিনবার প্রদক্ষিণ করল রাণীকে শ্বেত হস্তীটি। তারপর গভীর গর্জন করে রাণীর দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করে হস্তীটি তাঁর গর্ভে ঢুকে গেল।

স্বপ্ন ভেঙে ধড়মড় করে উঠলেন মহামায়া। আনন্দে ভরে গেল তাঁর মন। তখুনি গিয়ে তিনি রাজাকে বললেন এ স্বপ্নের কথা। রাজার মনও খুসিতে ভরে উঠল। তিনি রাজ্যের সেরা চৌষট্টিজন জ্যোতিষীকে ডেকে আনলেন।

জ্যোতিষীরা বিচার করে জানালেন—মহারাজের একটি পরম রূপবান, ভাগ্যবান ছেলে হবে। এই ছেলে যদি গৃহে থেকে রাজত্ব করে—তবে সে হবে সর্বশ্রেষ্ঠ সার্বভৌম সম্রাট ; আর যদি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়—তবে হবে পৃথিবীর পাপতাপহারী পরিত্রাতা।

"থাকে গৃহাশ্রমে পুত্র হবে রাজচক্রবর্তী
একচ্ছত্র করিবে ভুবন,
যায় যদি ধর্মাশ্রমে, দুঃখপূর্ণ জগতের
পাপভার করিবে মোচন।"

মহামায়ার বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ বৎসর। স্বপ্ন সত্য হল। এই বয়সেই রাণী সন্তান-সম্ভবা হলেন। ক্রমে মাধব মাস বৈশাখ এল। রাণী মহামায়া রাজাকে বললেন যে, তিনি বাপের বাড়ী যাবেন। শুদ্ধোদন পথ ঘাট সজ্জিত করবার আদেশ দিলেন। মোড়ে মোড়ে তোরণ করা হল,—স্বস্তিক, পূর্ণকুম্ভ, পতাকা দিয়ে সাজান হ'ল গোটা পথ। শুভদিনে দুই বোনে সোনার রথে চড়ে চললেন দেবদহে।

পথে পড়ে লুম্বিনী নামে এক উপবন। নানা রকমের ফুলে পাতায়, পাখীর ডাকে লুম্বিনী উপবন স্বর্গের মত মনোরম। মহামায়া লুম্বিনী বনে প্রবেশ করলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। রূপালী আলোকে ঝক্‌মক্ করছে লুম্বিনীর বনভূমি। শাল গাছের লাল লাল কচি পাতা-গুলির কি শোভা! মহামায়া একটা পাতা ছিঁড়তে যেই হাত তুলে চেষ্টা করলেন—অমনি একটা কাণ্ড ঘটে গেল। মনে হল আকাশ থেকে চাঁদ বুঝি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে মানুষের মত কেঁদে উঠল।

ছুটে এলেন মহাপ্রজাবতী, ছুটে এল রাজার লোকজন। ওরে শাঁখ বাজা, বাজা বাঁশী, ঢোল-নাগরা কাড়া-নাকাড়া বাজা,—এসেছে চাঁদের আলো দিয়ে গড়া স্বর্গের ছুলাল। মর মাটির বুকে এসেছে আজ অমরার অমৃতধারা!

বৈশাখী পূর্ণিমা রাতে আড়াই হাজার আশি বছর আগে লুম্বিনী বনের শাল-বৃক্ষতলে তিনি আবির্ভূত হ'লেন।

সাতদিনের দিন হঠাৎ রাজবাড়ীতে নহবৎ বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন বাজাতে বাজাতে ছিঁড়ে গেল সেতারের মূল তারটি।

"এই আনন্দের মাঝে সপ্তম দিবসে হায়
মায়াদেবী মুদিল নয়ন।"

রাণী মহামায়া ভগিনী মহাপ্রজাবতীর কোলে কুমারকে তুলে দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ছুই বোন—ছুই মা। একজন গর্ভে ধারণ করলেন, আর একজন কোলে করে বড় করে তুললেন কুমারকে।

* * *

কয়েকদিন পরের কথা। রাজসভায় যোগী কালদেবল এসে উপস্থিত হ'লেন। বৃদ্ধ যোগী সাদা চুল, সাদা দাড়ি। রাজাকে বললেন যোগি-পুরুষ—"মহারাজ, তোমার যে পুত্র হ'য়েছে তাঁকে দেখব আমি।"

প্রাচীন বৃদ্ধ যোগী তাঁর ছেলেকে দেখতে চান। এ তো পরম সৌভাগ্য! মাতৃহীন শিশু, একে যদি বৃদ্ধ ঋষি একটু

আশীর্বাদ করেন! রাজার হুকুমে তৎক্ষণাৎ কুমারকে নিয়ে আসা হ'ল। পায়ের কাছে কুমারকে রেখে রাজা বললেন—"যোগিবর, আপনি একে আশীর্বাদ করুন।"

কিন্তু কি আশ্চর্য, সকলে অবাক হ'য়ে দেখল যে, কালদেবল হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

শুদ্ধোদন ভয় পেয়ে গেলেন। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"যোগিবর, আপনি কাঁদছেন কেন? শিশুর কি কোন অমঙ্গল দেখছেন?"

"অমঙ্গল"—যোগী হেসে উঠলেন। সাদা চুল, সাদা দাড়ি সে হাসিতে ধব ধব করে উঠল; যেন হিমালয়ের সাদা বরফের উপর চাঁদের আলো পড়ল এসে। যোগী বললেন—"না, মহারাজ, অমঙ্গল কোথায়? ছেলে তোমার মঙ্গল-নিধান। আমার এক চোখে আনন্দের জল, অন্য চোখে বেদনার। আনন্দ এইজন্য যে, এত দিন পর তিনি এলেন, এবার পৃথিবীর পাপ-তাপ, দুঃখ-শোক দূর হবে, পৃথিবী ধন্য। আমিও ধন্য—তাঁকে দেখলাম। এই আনন্দ। আর কাঁদছি এই মনে করে যে, যখন ষোলকলায় এই শিশু চাঁদ পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবেন—তখন তাঁকে দেখতে পাব না; তার আগেই আমাকে দেহত্যাগ করে যেতে হবে। সেই অমৃতবাণী আমি শুনতে পাব না—দেখতে পাব না অমিতাভ বুদ্ধ জ্যোতিঃ।"

রাজার মুখ ভয়ে বিস্ময়ে বিবর্ণ দেখাল। কি বলছেন মহাযোগী?

যোগী বললেন—"মহারাজ, তুমি যে কত বড় ভাগ্যবান, তা তুমি কিছুই জান না। তোমার যদি সর্বশাস্ত্রে অধিকার থাকত, তবে এই শিশুর দেহে মহাপুরুষের বত্রিশটি লক্ষণ পরিষ্কার দেখতে পেতে। তোমার কপিলবস্তুর সিংহাসনে এর জায়গা কোথায়? পৃথিবীর মর্মমূলে এর চিরন্তন ধ্যানাসন পাতা রয়েছে! বসুন্ধরা এর রাজ্য। চক্রবর্তী সম্রাট ধরণীর কতটুকু অধিকার করেন? এর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হবে স্থান কাল অতিক্রম করে যুগে যুগে মানুষের হৃদয়ে। তুমি ভাগ্যবান, মহাভাগ্যবান।"

তারপর যোগি-পুরুষ এক আশ্চর্য কাণ্ড করলেন। হাত যোড় করে শিশুকে এই বলে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন—"তুমি অবতীর্ণ হ'য়ে পৃথিবীর ও নিখিল মানবের সকল মনোরথ সিদ্ধ করেছ, হে সিদ্ধার্থ, তোমাকে প্রণাম। মহামায়ার গর্ভে জন্মে তাঁকে ধন্য করেছ, মহাপ্রজাবতী গৌতমীর অঙ্কে বড় হ'য়ে তাঁকে কৃতার্থ করছ, হে গৌতম, তোমাকে প্রণাম। প্রাচীন শাক্যকুলে জন্মে তাকে অমর গৌরবে সার্থক করেছ, হে শাক্যমুনি, তোমাকে প্রণাম। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুতে পদে পদে বিপন্ন মানুষের, আর্ত মানুষের পরিত্রাণ করতে এসেছ হে তথাগত, তোমাকে প্রণাম। মহাতপস্যায় মহাজ্ঞান অর্জন করে জগতে করুণাধর্মের দিব্য জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করতে এসেছ, হে নবম অবতার বুদ্ধ, তোমাকে প্রণাম।"

কথা বলতে বলতে মহাযোগী কালদেবল অন্তর্হিত হলেন।

কয়েকদিন পর নামকরণ উৎসব হ'ল। কুমারের নাম রাখা হ'ল সিদ্ধার্থ। নামকরণ উৎসবে রাজা আটজন শ্রেষ্ঠ দৈবজ্ঞ আনালেন। তাঁদের সাতজন কুমার সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ গণনা করে বললেন যে, কুমার নিশ্চিত সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হবেন। যদি গৃহাশ্রমে থেকে সংসার করেন, রাজত্ব করেন—তবে রাজচক্রবর্তী সম্রাট্ হবেন। আর যদি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তবে অবতার-তুল্য পূজা পাবেন।

"থাকে গৃহাশ্রমে, হবে নৃপতি ধরার ;
হইবে সন্ন্যাসাশ্রমে বুদ্ধ অবতার।"

এই দৈবজ্ঞদলের বয়োকনিষ্ঠ কৌণ্ডিন্য এই বিচারে একমত হ'লেন না। তিনি বললেন—"কুমার রাজধর্ম করবেন না। বৃদ্ধ, রুগ্‌ণ, মৃত দেখে তাঁর মনে সংসার-বৈরাগ্য আসবে এবং সন্ন্যাসী দেখে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবেন ; শেষে মহা তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে, জগতে নূতন ধর্ম প্রচার করবেন।"

কথাগুলি শুদ্ধোদন ও মহাপ্রজাবতীর মর্মে বিদ্ধ হয়ে রইল।

* * *

সিদ্ধার্থ এখন সুন্দর কিশোর।

"মহোৎসবে বিদ্যারম্ভ করিলেন শুভক্ষণে
গুরু বিশ্বামিত্র সর্বশাস্ত্রে সুনিপুণ।"

এবং—

"সর্বশাস্ত্রে সুনিপুণ হইল কুমার আশু ;
ছিল যেন সর্ব শাস্ত্র প্রচ্ছন্ন অন্তরে—"

লেখাপড়ায়, খেলায়, মৃগয়ায় আনন্দে তাঁর দিন কাটে। কে আছে তাঁর মত তীরন্দাজ? অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য। আকাশের উড়ন্ত পাখী, দ্রুত ছুটন্ত হরিণ—কেউ তাঁর তীর থেকে বাঁচে না।

একদিন সিদ্ধার্থ ঘোড়ায় চড়ে একটি হরিণের পেছনে ছুটলেন। হরিণ প্রাণভয়ে বিদ্যুতের মত ছুটছে—আর তাকে ধরতে তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়েছেন সিদ্ধার্থ। আরও জোরে··· আরও জোরে···এইবার হরিণ তাঁর তীরের আওতায় এসেছে। সিদ্ধার্থ বাণ জুড়লেন ধনুকে। আকর্ণ বিস্তৃত টানলেন ধনুকের গুণ। হঠাৎ দেখলেন ক্লান্ত হরিণটি থেমে তাঁর দিকে তাকিয়েছে। কি সুন্দর তার চোখ! উজ্জ্বল, উদ্বেল, প্রাণভয়ে উৎকণ্ঠায় কি করুণ হরিণের চোখ দুটি। ধনুক নাবিয়ে নিলেন কুমার। হরিণটি ধীরে ধীরে চলে গেল।

করুণ চোখ দুটি তাঁর মনে দোলা দিয়ে গেল। কুমার ভাবলেন—হরিণ বনের পশু। সে তো কোন অপরাধ করেনি। নিরীহ পশু মেরে তাঁর লাভ কি? এইবার নজর পড়ল ঘোড়ার দিকে। একটানা এত ছুটে ঘোড়াটাও হাঁপাচ্ছে। আবার ভাবলেন জীবকে এই অনর্থক কষ্ট দেওয়া হয় কেন? ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন কুমার।

সেই দিন থেকে তাঁর শিকার, মৃগয়া-উৎসব বন্ধ হ'ল। তখন থেকে তিনি প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করে সময় কাটাতেন। কত কি ভাবনা তাঁর মাথায় আসত। একাই থাকতেন বেশি সময়।

সিদ্ধার্থ বললেন—"না, আমি দেব না, এটি আমার।" (পৃঃ ১৫)

একদিন নির্জনে কুমার বসে বসে ভাবছেন। উপরে সাদা মেঘখণ্ডের মত রাজহাঁসগুলি উড়ে যাচ্ছে। ফুলের গন্ধে, পাখীর গীতে চতুর্দিক মনোহর। এমন সময় একটি আহত হাঁস কুমারের কোলের উপর পড়ল। হাঁসটির বুকে একটি তীর বিদ্ধ হয়ে আছে। কুমার তাড়াতাড়ি তীরটি তুলে ফেলে আহত স্থানটা চেপে ধরলেন। রক্তে তাঁর দেহ ও পোষাক লাল হ'য়ে গেল। করুণায় কুমারের হৃদয় গলে গেল—চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল জল! আহাহা—পাখীটির কত কষ্ট হচ্ছে! পাখীটিও করুণ চোখে তাকিয়ে রইল কুমারের দিকে।

এমন সময় দেবদত্ত এল। দেবদত্ত সিদ্ধার্থের মামাত ভাই। দেবদত্ত বলল—"সিদ্ধার্থ, এই হাঁসটিকে আমিই মেরেছি, আমাকে দাও।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"না, আমি দেব না, এটি আমার।"

দেবদত্ত রেগে উঠল—"তোমার কেন?—আমি মেরেছি, এ শিকার আমার হবে।"

কুমার কহিলা ধীরে "হতজীব হত্যাকারী
পায় যদি ভাই! কোন ধর্মশাস্ত্র বলে
যে দেয় জীবন তারে, সে কি তারে পাইবে না?
হত নহে এই হংস, আহত কেবল,
আঘাতের ব্যথা ভাই! আজি বুঝিয়াছি আমি
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।

তোমারো ত আছে প্রাণ পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে
বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?”

দেবদত্ত অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইল।

সিদ্ধার্থ বললেন—“না ভাই, এ পাখী আমি দেব না, তুমি শাক্যরাজ্য চাও, আনন্দে দান করব ; কিন্তু আহত এ হাঁসটিকে আমি দেব না।”

দেবদত্ত আর কি বলবে ? সিদ্ধার্থ কি পাগল হয়েছে ? সে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর হাঁসটিও একটু সুস্থ হ'য়ে উড়ে গেল আকাশে। সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন।

সিদ্ধার্থের মধ্যে একটা ভাবান্তর দেখল সবাই, তরুণ ছেলে, দলবল, সঙ্গীসাথী ছেড়ে একা একা ঘুরে বেড়ায় কেন ? এর কি বিহিত করবেন—রাজা ভেবে পেলেন না।

এমন সময় হলোৎসব এল। শাক্যকুল ছিল কৃষিজীবী। কাজেই হলোৎসব শাক্যদের খুব বড় উৎসব। রাজা নূতন পোষাক পরে বলদকে ভাল করে সাজিয়ে নিজে সোনার লাঙল দিয়ে চাষ করতেন। সব প্রজারাও যে যার মত সাজ করে জমিতে হল চালনা করত।

হলোৎসব আরম্ভ হ'ল। নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা সুরু হ'ল। সিদ্ধার্থও উৎসবে আছেন। হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল মাটির দিকে। দেখলেন—অসংখ্য কীট পতঙ্গ হলের মাথায়,

পায়ের তলায় পড়ে মারা যাচ্ছে। লাঙ্গলের মুখে মাটির উপর যে সব কেঁচো ও অন্যান্য কীট উঠছে—কাক, শালিক ও নানা পাখীতে এসে মহা উৎসাহে সেগুলির ভোজ লাগাচ্ছে। অসংখ্য অসহায় জীব মরে যাচ্ছে এমনি করে। সিদ্ধার্থ এই প্রাণিহত্যার দৃশ্য আর দেখতে পারলেন না। বেদনায় তাঁর সারা প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠল।

নগরে উৎসব ধ্বনি, পল্লীর আনন্দ ধ্বনি
প্লাবি বিশ্বব্যাপী যেন কিবা হাহাকার ;
জীবের কি দুঃখগীতি উঠিতেছে চারিদিকে !
গর্জিতেছে চারিদিকে যেন পারাবার !

তিনি সেখান থেকে ছুটে চলে গেলেন বনের দিকে। একটা প্রকাণ্ড জম্বুবৃক্ষ অর্থাৎ জাম গাছ ছিল বনে। তার নীচে সিদ্ধার্থ পদ্মাসনে বসে জীবের দুঃখের কথা ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে একেবারে ধ্যানস্থ হ'য়ে পড়লেন।

কর্ষণ হয়ে গেল। দুপুর বেলায় মনে পড়ল সিদ্ধার্থের কথা। কুমার কোথায় ? বন্ধুরা সব খুঁজতে বেরুল দিকে দিকে। রাজা রাণী উদ্বিগ্ন হয়ে ঘর-বার করতে লাগলেন। এমন সময় খবর এল কুমারকে পাওয়া গেছে। কোথায় ? রাজারাণী ছুটে চললেন।

জম্বুবৃক্ষমূলে তখনও কুমার ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। সূর্য তখন অস্তোন্মুখ। তার লাল আলোয় তরুণ যোগীর দেহে কি জ্যোতিঃ ফুটে উঠছে। মহাপ্রজাবতী গিয়ে পুত্রের গায়ে হাত

দিলেন। মমতাময়ী মায়ের স্পর্শে কুমারের চেতনা ফিরে এল, ধ্যান ভেঙে গেল। পিতাকে দেখে কুমার বলে উঠলেন—"বাবা, তুমি হল কর্ষণ বন্ধ করে দাও, এতে কত জীবের প্রাণ নাশ হয়। বাবা, জীবহত্যায় সুখ নেই, সুখ আছে জীবে দয়ায়।"

রাজারাণী দুজনেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রাণী কাঁদতে লাগলেন। সিদ্ধার্থ কি সংসারে থাকবে না—সত্যই কি সন্ন্যাসী হ'য়ে চলে যাবে? রাণী জিজ্ঞাসা করলেন—"কুমারকে এমন করে ধ্যান করতে কে শেখালে মহারাজ?"

রাজা একটু বিষণ্ণ হাসি হাসলেন। বললেন—"কে শেখাবে? তুমি যে পুত্রের জন্য কাঁদছ, কে তোমায় শিখিয়েছে কাঁদতে?"

রাণী একথা মানলেন না, তিনি কুমারের মন ফেরাবার জন্য ব্যবস্থা করতে বললেন। রাজার মনে দৈবজ্ঞের সেই ভবিষ্যৎবাণীগুলি কাঁটার মত আটকে আছে। রাজা গোপন বৈঠক করলেন অমাত্যদের নিয়ে। ঠিক হল কুমারকে রাজপুরীর মধ্যে আটকে রাখতে হবে নজরবন্দীর মত। প্রমোদ উদ্যান বানিয়ে সেখানে নানা বিলাস ও আমোদের উপকরণ ঠিক করে রাখতে হবে। কুমারের বয়স সতের বৎসর। যৌবন আসবার মুখেই মনটাকে টেনে আনতে হবে ভোগের দিকে। পৃথিবীর কোন দুঃখ কষ্ট যেন কুমারের চোখের সীমায় না আসে। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—কিছুই যেন কুমার না জানতে পারে। আর

একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কুমারের বিয়ে দিতে হবে। নারীর, বিশেষ করে যৌবনে স্ত্রীর ভালবাসাই তো সংসার।

পরামর্শ শুনে শুদ্ধোদন একটু হাসলেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন—"তোমরা বলছ চেষ্টা করে দেখবে। কিন্তু নিয়তিকে আটকান যাবে না। হিমালয় থেকে যে জলধারা সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে, বালুর বাঁধ দিয়ে তাকে আটকে রাখবে কে? তবু দেখ যে কদিন ধরে রাখা যায়। কিন্তু বিয়ে সম্বন্ধে কুমারের মত জানতে হবে আগে। তার মত না নিয়ে কিছু করা ঠিক হবে না।"

বন্ধুদের পাঠানো হল কুমারের মত জানতে। সিদ্ধার্থ বললেন—"সাতদিন পরে বলব।" সাতদিন ভাবলেন কুমার, অনেক ভাবনা। তিনি কি করবেন জীবনে? সংসার তো প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতি মানুষকে বাঁধে। জীবন রক্ষার জন্য জীব-জগতে যে যুদ্ধ হচ্ছে—জীবন-যুদ্ধ, তার মূল কথা হিংসা। হিংসাদ্বেষপূর্ণ সংসার ক'রে কি হবে? তার চেয়ে জীবের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করা ভাল। না, বিবাহ করবেন না কুমার। এই-ই ঠিক।

কিন্তু এই কথা মাকে জানাতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন সিদ্ধার্থ। তিনি যদি বিয়ে না করেন, সংসারে কেউ যদি এমনি ঘর-সংসার না করে, তবে তো লোক-যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। এটাও তো সঙ্গত নয়। বরং সংসারে ভোগের মধ্যে থেকেই বৈরাগ্য সাধনা করা দরকার;—ত্যাগ মানে মন থেকে ত্যাগ। সংসারে

থেকেই তা না করা যাবে কেন? তাতে বিবাহে বাধা কি?—
কোন বাধা নেই। বিবাহ তিনি করবেন ঠিক করলেন।

কি রকম পাত্রী চাই, তাও বলে পাঠালেন কুমার।

"রূপকুল জন্ম গোত্র বিশুদ্ধ যাহার
রূপসী বিদুষী নম্রা, ঈর্ষা নাহি যার।
মুখে প্রফুল্লতা, বুকে করুণা আলয়,
হস্তে পর-সেবা, বাক্য মধুরতাময়।
স্নেহে মাতা ভগ্নী সমা, পতিপরায়ণা
নাহি মনে প্রগল্‌ভতা, তর্কে অপ্রবণা।
দানে ধর্মে অনালস্য, জানে আত্মসম
সর্বজীবে, সেই নারী হবে পত্নী মম।"

কিন্তু এমন মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়? রাজা চিন্তায় পড়লেন। কিছু সময় গেল মেয়ে খুঁজে। ফল হল না। শেষে পাত্রী নির্বাচন করবার জন্য একটা কৌশল করলেন শুদ্ধোদন। ঘোষণা করলেন যে কুমার অশোকভাণ্ড বিতরণ করবেন। দেশের শাক্যকুমারীরা এসে কুমারের হাত থেকে মণিকাঞ্চনে পূর্ণ অশোকভাণ্ড নেবে।

যথাসময়ে সুসজ্জিত গৃহে কুমার অশোকভাণ্ড দান করতে আরম্ভ করলেন। সুন্দরী, সুসজ্জিতা শাক্যকুমারীরা এসে কুমারের হাত থেকে অশোকভাণ্ড নিয়ে যেতে লাগল। শত

শত কুমারী দান নিয়ে গেল ; কুমার কারো দিকে ভাল করে ফিরেও চাইলেন না, অশোকভাণ্ড ফুরিয়ে গেল।

এমন সময় ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করলেন দণ্ডপাণির কন্যা গোপা। কুমার মেয়েটির দিকে তাকালেন—গোপাও তাকালেন কুমারের দিকে। যেন কতদিনের পরিচিত তাঁরা। কত যুগের স্মৃতি—কুমারের মন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কে, কে—কে এই কন্যা ? কুমার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করলেন—"কে তুমি ?"

গোপা চমকে উঠলেন। এতক্ষণ তিনিও নিষ্পলক চোখে চেয়েছিলেন কুমারের দিকে। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে বললেন—"আমি গোপা।"

আবার চুপচাপ।

ভারি লজ্জা করছে গোপার, সলজ্জ কণ্ঠে বললেন—"কুমার, কোন অপরাধ হয়েছে আমার ? কেন আমায় অশোকভাণ্ড দিচ্ছেন না !"

সিদ্ধার্থ একবার শূন্য পাত্রের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—"অশোকভাণ্ড ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তোমাকে অন্য উপহার দিচ্ছি গোপা।" এই বলে নিজের আংটিটি খুলে দিলেন গোপার হাতে।

আর একবার সিন্দূরবর্ণ হল গোপার মুখ। গোপাও নিজের হাত থেকে আংটিটি খুলে কুমারের হাতে দিয়ে বললেন—"আপনার আঙুলটা নিরাভরণ দেখে আমার ভাল লাগছে না, আমার এই আংটিটি আপনি পরুন।"

পাত্রী নির্বাচিত হ'য়ে গেল। শাঁখ বেজে উঠল রাজ-পুরীতে।

সিদ্ধার্থের বয়স তখন উনিশ। প্রকাণ্ড এক রঙ্গভূমি তৈরী করা হ'ল ময়দানে। সেখানে সশস্ত্র বীরগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে তবে কন্যার পাণি গ্রহণ করতে হয় এই ছিল শাক্য কুলের প্রথা। এই যুদ্ধে সিদ্ধার্থ এমন সব অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল দেখালেন, শৌর্য প্রকাশ করলেন যে বড় বড় সেনাপতিরা পর্যন্ত অবাক হ'য়ে গেলেন। সারা জীবন বিলাসে প্রমোদে কাটিয়ে কুমার এমন যুদ্ধবিদ্যা শিখল কোথায়?

মহা-সমারোহে গোপার সঙ্গে কুমারের বিয়ে হ'য়ে গেল।

ছোট্ট নদী রোহিণী। তার তীরে চমৎকার একটি প্রমোদ কানন। ফুলে, পাতায়, পাখীর গানে সেখানে চির বসন্ত বাঁধা পড়ে আছে। উত্তরে অনন্ত সুনীল আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হিমালয়—তুষার-মৌলি হিমালয় মহাবিষ্ণুর শ্যামল ললাটে শ্বেত চন্দনের ফোঁটার মত। এই মনোরম উদ্যানে গোপাকে নিয়ে সিদ্ধার্থের দিন রাত স্বপ্নের মত আনন্দে কাটতে লাগল। গোপা ও সিদ্ধার্থ দুজনেই পরস্পরের ভালবাসায় আত্মহারা হলেন।

"গোপার মধুর প্রেমে করিল প্রমোদপুরী
প্রেমের মাধুর্যে প্রপূরিত;

গোপার প্রেমের স্রোতে বৈরাগ্য চলিল ভাসি
সিদ্ধার্থ হইল নিমজ্জিত।
গোপা রূপবতী, গোপা গুণবতী, ধর্মে মতি
পতি প্রেমে পূর্ণ মাতোয়ারা।
সিন্ধুগর্ভে নদীহেন সিদ্ধ সাধিকার মত
পতিপদে গোপা আত্মহারা।"

* * *

বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন ও মাতা মহাপ্রজাবতীর দুশ্চিন্তা খানিকটা যেন কেটে গেল। রাজা ভাবলেন বুনো হাতীকে এবার সোনার শিকলে বেঁধে ফেলেছি, আর যায় কোথায়? রাণী দেখলেন, ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-চিন্তা ছেড়ে ছেলে তার বউ নিয়ে দিন রাত মেতে আছে। যদি গৃহে থাকে সিদ্ধার্থ তবে রাজচক্রবর্তী সম্রাট্ হবেন—রাজারাণীর চোখে সাম্রাজ্যের সোনালী স্বপ্ন চিক্ মিক্ করে উঠে···

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি। নাচে গানে প্রমোদ কানন মাতাল হ'য়ে উঠেছে। হঠাৎ সিদ্ধার্থ চমকে উঠলেন। গোপা ছিলেন কুমারের পাশেই। জিজ্ঞাসা করলেন—"কি, কুমার?"

সিদ্ধার্থ একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বললেন—"না, কিছু না।"

একটু পরে সিদ্ধার্থ গোপাকে ধাক্কা দিয়ে বললেন—"গোপা শুন্ছ?"

—"কি?"

—"বাঁশী। এত কান্না কে কাঁদে বাঁশীতে?"

—"কই, শুনছি না ত।"—অবাক হ'য়ে তাকালেন গোপা কুমারের দিকে।—"এই নাচ গানের মধ্যে তুমি বাঁশীর কান্না কোথায় শুনছ ?"

কুমার বিহ্বলের মত তাকিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, নাচ গান আনন্দ, কিন্তু আমি শুনছি যে—"

—"অসুখ করেছে তোমার"—গোপা বললেন—"বন্ধ করে দি নৃত্য গীত, তুমি বিশ্রাম কর।"

"না, না"—কুমার ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন—"বন্ধ করো না ; সারা রাত, সারা জীবন এই আনন্দের সুরে কান্নার বাঁশীকে ঢেকে দাও। আরও আনন্দ—আরও নৃত্য—আরও গান আমি চাই।"

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। গানের আসর ভেঙে গেছে। শ্রান্ত গোপা শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন কুমারের পাশে। অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম আকাশে শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ। সিদ্ধার্থ উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছেন—কান্নার গান। করুণ বাঁশী যেন আকুল হ'য়ে ডাকছে—এস, এস

"এই দেহ সুকুমার এই প্রেম পুষ্প হার
শুকাইবে রবে না কখন।
অনিত্য এ সুখ ছাড় নিত্য সুখ অধিকার
কর তুমি কর নিষ্ক্রমণ।"

ঠিকই তো ! সিদ্ধার্থ শয্যার উপর উঠে বসলেন। অনিত্য এ সুখ, বাসি মালার মত ঝরে পড়বে ধূলায় যৌবন, জীবন—সব। শান্তি কোথায়—কোথায় সত্য ?

অনেক বছর পর আবার গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন সিদ্ধার্থ।

* * * *

রাজা শুদ্ধোদন মনে মনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন! ছেলে তাঁর ঘরে বাঁধা পড়েছে। শান্তিতে ঘুমুচ্ছিলেন রাজা পালঙ্কে। দেখলেন—নিশীথ রাত্রে কুমার পোষাক পরিচ্ছদ সব ফেলে দিয়ে সন্ন্যাসীর পোষাকে হেঁটে চলেছেন আর পেছনে ছুটেছে অসংখ্য অগণিত লোক জয়ধ্বনি করতে করতে।...

স্বপ্ন দেখলেন রাজা।

"কঞ্চুকী, কঞ্চুকী"—আর্তনাদ করে উঠলেন শুদ্ধোদন। ছুটে এল কঞ্চুকী। এল দেহরক্ষীর দল। ঘর্মাক্ত দেহে ক্ষীণ কণ্ঠে রাজা বললেন—"কুমার কোথায়? সিদ্ধার্থ কই?"

কঞ্চুকী বলল—"কুমার তাঁর মহলে ঘুমুচ্ছেন মহারাজ।"

ঘুমুচ্ছেন? তাহলে স্বপ্ন দেখেছেন তিনি?—হ্যাঁ স্বপ্ন। রাজা শুয়ে পড়লেন—কিন্তু স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে···

উন্মনা হলেন কুমার। ভাল লাগে না নাচ-গান, শোভা-সৌন্দর্য, বিলাস-ব্যসন। অনেক বছর পর তিনি ডেকে পাঠালেন সারথিকে—হুকুম দিলেন রথ সাজাতে। ভ্রমণে বেরুবেন কুমার।

আনমনা কুমার রথে বসে ভাবছেন। ঘোড়া চল্‌ছে খট্ খট্ খট্।

"ছন্দক, ছন্দক"—সারথির উত্তরীয় ধরে টানলেন সিদ্ধার্থ। রথ থামাল সারথি।

কুমার বললেন—"দেখ দেখ মানুষের মত কি একটা জানোয়ার যাচ্ছে না!"

ছন্দক দেখল একটি বৃদ্ধ লোক লাঠি নিয়ে অতি কষ্টে পথ চলছে—তার সাদা চুল দাড়ি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। লোল দেহ কাঁপছে থর থর করে...

"না কুমার"—ছন্দক বলল—"জানোয়ার নয়, মানুষ। বৃদ্ধ হয়েছে।"

"বৃদ্ধ হবে কেন?"—কুমার প্রশ্ন করলেন—"বৃদ্ধ হওয়া কি ওর কুলধর্ম?"

মলিন হাসি হেসে ছন্দক বলল—"না কুমার, শুধু ওর না—সকল মানুষেরই কুলধর্ম বৃদ্ধ হওয়া। জরা অতিক্রম করবে কে? সকলকেই ওর মত হতে হবে একদিন।"

"সকলকেই?"—বিস্মিত হ'লেন সিদ্ধার্থ। "তুমিও একদিন ঐরকম মাংসপিণ্ড হ'য়ে যাবে?"

"হ্যাঁ, হব।"

"আমি?"

"আপনিও হবেন?"

"গোপা?"

"হ্যাঁ কুমার, দেবী গোপাও হবেন।"

আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সিদ্ধার্থের মুখ। ক্ষীণকণ্ঠে

শুধু বললেন—"রথ ফেরাও বাড়ী যাব।"

আর একদিন।

"ছন্দক—"

"বলুন কুমার"—রথ থামাল ছন্দক।

"দেখ তো এ-ও কি জরা ?"

ছন্দক দেখল, রাস্তার পাশে বসে একটা লোক হাঁপাচ্ছে। শরীর তার শুকিয়ে গেছে। চক্ষু কোটরে, মুখ বিবর্ণ, হাত পা ফুলে উঠেছে, শ্বাস ছাড়তে পারছে না মানুষটি।

"হে দেব"—সারথি কহে, "জরা নহে, পীড়া এই
জরার অধিক ক্লেশকর।
নিবিবে জীবনদীপ হরণ করেছে তৈল
হায় পীড়া নিষ্ঠুর অন্তর।"

"ব্যাধি হয় কেন ?"—বিবর্ণ মুখে প্রশ্ন করলেন সিদ্ধার্থ। "জীবের শরীরে রোগ থাকবেই কুমার। শরীর ব্যাধি-মন্দির। দেহে জরাও যেমন, ব্যাধিও তেমন অনিবার্য।"

ভয়ে পাণ্ডুর হলেন কুমার। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—"বাড়ী যাব।"

আর একদিন।

খাটিয়ায় করে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে একটা মানুষকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে লোকেরা। পেছনে আর্তনাদ করতে

করতে চলেছে লোকজন। কেউ মাটিতে পড়ে চিৎকার করছে ; কেউ বুকে, কপালে আঘাত করছে।

"কি ব্যাপার ছন্দক?"—কুমার জানতে চাইলেন।

"সারথি বিষাদে কহে খাটের উপরে দেব
হতভাগ্য মৃত একজন।
জীব-খেলা শেষ তার পত্নী পুত্র পরিবার
পৃথিবীতে দেখিবে না আর।
ফুরায়েছে সুখ-ভোগ গৃহ তার অন্ধকার
পরিজন করে হাহাকার।"

"মরল কেন?"—কুমার শিশুর মত প্রশ্ন করলেন।—

"মানুষ, শুধু মানুষ কেন, জীবই মরণশীল, কুমার। মৃত্যুর হাত থেকে কারো পরিত্রাণ নাই।"

"তুমি মরবে?"

"হ্যাঁ, দেব।"

"আমি?"

"আপনিও বাদ যাবেন না।"

"গোপা?"

"তাঁরও পরিত্রাণ নেই কুমার।"

দুহাতে মুখ চেপে ধরলেন সিদ্ধার্থ। "সবাই মরবে, সবাই মরবে—কি ভয়ঙ্কর, রথ ফেরাও...রথ ফেরাও ছন্দক।"

আর একদিন।

বিষণ্ণ কুমার গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। হঠাৎ রথের গতি কমে এল। সচকিত হ'য়ে কুমার দেখলেন একজন মানুষ ধীর গতিতে পথ পার হ'য়ে যাচ্ছে। মুণ্ডিত মস্তক, হাতে দণ্ড, পরণে গেরুয়া—পথচারী সকলে হাত যোড় করে প্রণাম জানাচ্ছে। কুমার ছন্দকের কাছে এঁর পরিচয় জানতে চাইলেন।

সারথি ভকতি ভরে কহিল—সন্ন্যাসী ইনি
সংসার করিয়া পরিহার।
লইয়া সন্ন্যাস ব্রত ইন্দ্রিয় করি সংযত
হয়েছেন বিনয় আধার।
রাগ নাই, দ্বেষ নাই, সংসার কামনা নাই।
একমাত্র ভিক্ষান্নে জীবন
করেন যাপন ইনি ; করেন প্রীতির ক্ষেত্রে
সর্বজীবে সমান দর্শন।

কুমারের মুখ দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। পথ আছে তবে......এই পথ......ত্যাগের পথ......আছে, আছে পথ। আছে, আছে। কুমার অস্ফুট স্বরে বললেন—"চল চল, এগিয়ে চল—এগিয়ে চল।"

কুমার ঠিক করে ফেললেন, সংসার ত্যাগ করবেন। কিন্তু মুস্কিল হ'ল বাবাকে নিয়ে—বুড়ো মানুষ, দুঃখ পাবেন খুব। মা গৌতমী হয়ত মরেই যাবেন। আর গোপা? এত কোমল, এত সুন্দর, এত মধুর......

প্রেমরূপী প্রাণধারা ঢালিয়াছে অবিরল
সুশীতল নির্ঝরিণী মত।
একটি কঠোর কথা কহে নাই কোন দিন—

কেমন করে, কি অপরাধে ছেড়ে যাবেন তাঁকে। বেদনায় টন্ টন্ করে উঠল কুমারের বুক।

কিন্তু জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—তার থেকে পরিত্রাণ কোথায় ?

"না—না, সন্ন্যাসের পথে দাঁড়াইয়া তিনজন
বৃদ্ধ পিতা, মাতা ওই আর
তাঁহার প্রাণের গোপা তাঁহার প্রেমের গোপা—"

দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল সিদ্ধার্থের।

* * *

দিন যায়—দিন আসে।

কুমার একদিন ভাবছেন এমন সময় রাজ-অন্তঃপুরে একটা আনন্দ-কলরব উঠল। ছুটে এসে এক অনুচর খবর দিল কুমারকে—"যুবরাজ, পুরস্কার দিন। আপনার পুত্র হয়েছে, কি সুন্দর ফুটফুটে খোকা।"

চমকে উঠলেন সিদ্ধার্থ। পুত্র! পিতা, মাতা, পত্নী এই তিন ডোরে তাঁকে বেঁধে রেখেছে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর পথে—তার উপর চতুর্থ শৃঙ্খল পুত্র। বন্ধনের উপর বন্ধন। না—না —না। সিদ্ধার্থ স্থির করলেন—এক্ষুনি সংসার ছেড়ে যেতে হবে…আর দেরী নয়, ভাবনা নয়—এক্ষুনি।

রাত্রি এল। হালকা অন্ধকারে ঢেকে গেল সুন্দরী কপিলবস্তু নগরী। দীপমালা জ্বালা হল নগরের ঘরে ঘরে। যুবরাজের পুত্রের জন্মোৎসব সুরু হ'য়ে গেল। ফুলে ফুলে রাজপথ দুর্গম হ'ল, শঙ্খ ঘণ্টা মঙ্গল-বাদ্যে তালা লেগে গেল কানে। উচ্ছল, উদ্দাম, অফুরন্ত উৎসব।

কুমার ধীরে ধীরে রাজপুরীতে এলেন। মাতা প্রজাবতী সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে এলেন সিদ্ধার্থের সামনে। অপলক চোখে জাতকের মধ্যে জন্ম প্রত্যক্ষ করলেন সিদ্ধার্থ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানস চক্ষে দেখলেন জন্মের পিছু পিছু আসছে জরা, আসছে ব্যাধি, আসছে মৃত্যু—উঃ! আর্তনাদ করে উঠলেন কুমার।

বিস্মিতা প্রজাবতী বললেন—"কি হল? দেখ কি সুন্দর হ'য়েছে দাদু আমার।"

সিদ্ধার্থ উঠে বেরিয়ে গেলেন বাগানে। বাগান থেকে ঘরে। ঘর থেকে আবার পথে। রাজপুরীতে উৎসব হচ্ছে। অপরিমিত সুরা পান ক'রে উদ্দাম নাচ গান করছে তরুণীরা। কিন্তু সমস্ত গানের মধ্যে সিদ্ধার্থের কানে আসছে এক কান্নার সুর, শোকার্ত মানুষের আর্তনাদ—"এস, এস তুমি।"

"না শুনি সঙ্গীত যুবা শুনিছে কেবল
জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত-জীব-হাহাকার।
না দেখি নর্তকী মুখ, দেখিছে কেবল
জরা জীর্ণ রোগে শীর্ণ, মৃত নিরন্তর।"

নিশীথ রাত্রি...সদ্যোজাত শিশু বুকে করে গোপা ঘুমিয়ে আছেন। কি সুন্দর গোপা, কি সুন্দর শিশু! প্রস্ফুট কমলের পাশে স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকলি। মুগ্ধের মত গিয়ে সিদ্ধার্থ শয্যার উপরে বসলেন, অতৃপ্ত চোখে দেখতে লাগলেন গোপাকে।

হঠাৎ গোপা আর্তনাদ করে উঠে বসলেন! "কুমার—কুমার।" সিদ্ধার্থ কাছেই ছিলেন। গোপার মাথায় হাত দিয়ে বললেন—"কি গোপা?"

গোপা কুমারকে জড়িয়ে ধরলেন দুই হাতে—"না, না, আমি দেব না তোমায় যেতে, নিতে দেব না তোমাকে।" সমস্ত শক্তি দিয়ে সিদ্ধার্থকে আকর্ষণ করলেন গোপা!

স্নিগ্ধ কণ্ঠে সিদ্ধার্থ বললেন—"স্বপ্ন দেখেছ গোপা? কি স্বপ্ন?"

গোপার চেতনা ফিরেছে খানিকটা। বাহু ডোর শিথিল করে বললেন—"স্বপ্ন! হ্যাঁ স্বপ্ন। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন! আমার ভয় করছে। কি দেখলাম জান? দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ঝড় এল। সমস্ত পৃথিবী ধূলোয় অন্ধকার হ'য়ে গেল। চন্দ্র সূর্য তারা সব নিবে গেল আকাশে। আর সেই ভীষণ হাওয়ায় তোমার রাজমুকুট পোষাক উড়িয়ে নিয়ে গেল; আমার অন্তর ছিঁড়ে গেল, তোমার সুন্দর চুলগুলি শূন্যে মিলিয়ে গেল। গুরু গুরু গর্জনে পৃথিবী উঠল কেঁপে। দেখলাম প্রকাণ্ড একটা জ্যোতির্ময় আলোকে আবৃত হ'য়ে

উল্কার মত তুমি ছুটে চলেছ—দূরে দূরে......আমি চীৎকার করে উঠলাম। আমার ভয় করছে। ওগো, তুমি যেও না। এই কুস্বপ্ন দেখে ভয় করছে আমার।"

সিদ্ধার্থ পরম স্নেহে গোপার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন—"ঘুমোও গোপা, ভয় নেই। আর—

এ নহে কুস্বপ্ন, মহা প্রীতি সুখে সুখী
হইব আমরা সুখী হইবে জগৎ।"

গোপা ঘুমিয়ে পড়লে কুমার বেরিয়ে এলেন প্রমোদ কক্ষে। সুরা-মাতাল নর্তকীরা এলিয়ে পড়েছে ঘুমে। বিস্রস্ত বসন, অবিন্যস্ত কুন্তল···সর্ব অঙ্গে উৎকট আমোদের বিকট ক্লান্তি। কোথায় সৌন্দর্য, কোথায় মাধুর্য এদের দেহে? মাংস-হাড়, রূপ যৌবন সবই তো কালের খাদ্য। জরা ব্যাধি মৃত্যু আসছে, গ্রাস করতে আসছে এদের। উপায় কি? পথ কোথায়, কোথায় পথ? ছুটে বেরিয়ে গেলেন কুমার ঘর থেকে।

না, না, সংসার ত্যাগ করতে হবেই। সিদ্ধার্থ পিতার কক্ষে প্রবেশ করলেন। জেগেছিলেন শুদ্ধোদন। সিদ্ধার্থ পায়ে হাত দিতেই উঠে বসলেন তিনি।

সিদ্ধার্থ বললেন—"বাবা সংসার ত্যাগ করব আমি,—তপস্যা করব। আমাকে অনুমতি দাও।"

চমকে উঠলেন বৃদ্ধ—"সংসার ত্যাগ? কেন? কি অভাব তোমার? সংসারে কি তুমি চাও বল। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই তো সংসারে পাওয়া যায়। কি চাও তুমি?

কহিলেন রাজপুত্র—"চারি বর তবে
দেও দাসে দয়া করি ; দিলে চারি বর
থাকিব সংসারে, গৃহ ছাড়িব না আর।
জরায় যৌবন ফুল যেন না শুকায় ;
ব্যাধি যেন কভু নাহি পরশে আমায় ;
মৃত্যু যেন নাহি আসে নিকটে আমার
পাই সে সম্পদ যাহা অক্ষয় অপার।"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাজা বললেন—"তা হয় না পুত্র, জগতের বিধিই এই। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু—এ থেকে কারো কোনদিন পরিত্রাণ নেই। এ অসম্ভব।"

"না, অসম্ভব নয়"—ধীর কণ্ঠে বললেন সিদ্ধার্থ—"আমি এ থেকে মুক্তির পথ আবিষ্কার করব, পরম শান্তির পথ খুঁজে বার করবই আমি। আমাকে প্রশান্ত মনে তুমি বিদায় দাও। সিদ্ধার্থ নামকে যেন সার্থক করে তুলতে পারি—আশীর্বাদ কর।"

শুদ্ধোদন পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন। সিদ্ধার্থের জন্মকালের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। ছায়া-ছবির মত ফুটে উঠল মহাযোগী কালদেবলের বাণী। রাজা স্পষ্ট শুনতে পেলেন—"ভাগ্যবান, মহাভাগ্যবান্ তুমি। চকিতে শুনতে পেলেন রাজা কৌণ্ডিন্যের ভবিষ্যদ্বাণী। এই শিশু
……করিবে মোচন।
পৃথিবীর পাপ তাপ মোহ আবরণ।"

কে কাকে ধরে রাখে? কেমন করে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখা যায় সূর্যের জ্যোতিকে?—সে যে বিশ্বের, সে যে সকলের।

পুত্রের মাথার উপরে কম্পিত হাত রাখলেন রাজা। অবরুদ্ধ কণ্ঠকে সবলে মুক্ত করে বললেন—"বেশ যাও, জগতের মঙ্গল কর তুমি। মোক্ষ-পথ তোমার করায়ত্ত হোক! হও তুমি পূর্ণমনোরথ।"

রাত্রি তৃতীয় প্রহর···উৎসবে ক্লান্ত কপিলবস্তু ঘুমিয়ে পড়েছে। কুমার সারথি ছন্দককে ডেকে তুললেন। হুকুম করলেন কণ্টককে আনতে। কুমারের প্রিয় অশ্ব কণ্টক।

ছন্দক কুমারের মন বুঝত। তার সন্দেহ হ'ল। খানিকক্ষণ চুপ করে শেষে ছন্দক জিজ্ঞাসা করল—

"কহ যুবরাজ
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়?"

ছন্দক সিদ্ধার্থের ভৃত্য বটে, কিন্তু বন্ধুর মত ছিল তার ব্যবহার। সিদ্ধার্থ তাকে গৃহত্যাগের কথা জানালেন। শুনে ছন্দক আর্তনাদ করে কেঁদে উঠল। তার বুদ্ধি-যুক্তি-মত মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র সকলের কথা বলে বলে কত বোঝাল সিদ্ধার্থকে, কিন্তু সিদ্ধার্থ স্থির-সংকল্প, আজই গৃহত্যাগ করবেন। কাঁদতে কাঁদতে ঘোড়া আনতে গেল ছন্দক।

কুমার ফিরে এলেন গোপার কক্ষে। দেখলেন

"নিদ্রা যাইতেছে গোপা বক্ষে সদ্যঃ শিশু
—সোনার প্রতিমা বক্ষে সোনার কুসুম—"

সিদ্ধার্থের সাধ হ'ল একবার ছেলেটিকে কোলে নেন। কিন্তু ভয়, যদি গোপা জেগে উঠে—তবেই সর্বনাশ! গোপা আর তার শিশু—কি সুন্দর, কি পবিত্র...

"চাহিয়া চাহিয়া পত্নী-পুত্র মুখপানে
হইলেন ধ্যানমগ্ন।"

কিন্তু এই সৌন্দর্য কতক্ষণ স্থায়ী? আসছে জরা, আসছে ব্যাধি, আসছে মৃত্যু। চমকে উঠলেন সিদ্ধার্থ।

"শুনিলেন কর্ণে
জরা-ব্যাধি-ব্যথিতের ঘোর হাহাকার।
ঘোর দুঃখপূর্ণ ধরা, কত নরনারী
কত গোপা, কত শিশু, ব্যাপি ভবিষ্যৎ
পড়িতেছে দুঃখানলে, দেখিলা নয়নে॥"

—জগতের এই দুঃখ দূর করতে যেতেই হবে তাঁকে, যেতেই হবে।

দ্রুত বেরিয়ে এলেন সিদ্ধার্থ। ছন্দক শোকে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিল কণ্টকের লাগাম ধরে। এগিয়ে এলেন কুমার—

কণ্টক, কণ্টক—অশ্বে ডাকিয়া আদরে
উঠিলেন এক লম্ফে সিদ্ধার্থ আকুল—

ধীর কদমে কন্টক চলতে লাগল। পেছনে ছন্দক, দুই চোখে তার অশ্রুর বন্যা। রাজপুরী অতিক্রম করে, রাজপথের প্রান্তে এলেন তাঁরা। আকাশে চাঁদ উঠেছে। রূপালী আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে কপিলবস্তু। ছন্দক বলল—"যুবরাজ, তোমার শৈশব-বাল্য, কৈশোর-যৌবনের লীলাভূমির দিকে তাকাও। এইখানে আছেন তোমার বাবা-মা, তোমার পত্নী-পুত্র—তোমার জীবনের কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি—

দেখ রাজপুরী
নিরমল জ্যোৎস্নার শ্বেত শুভ্রবাসে
কাঁদিতেছে হায়! নব বিধবার মত।"

সিদ্ধার্থ তাকালেন পুরীর দিকে। হৃদয়ের বৈরাগ্য-জ্যোতিঃ বেরিয়ে এল কুমারের দৃষ্টিতে। বললেন—"না ছন্দক, ভুল দেখছ তুমি। এই মহাপুণ্যক্ষণে দেবগণ স্বর্গের অমল-ধবল পুষ্প দিয়ে বন্দনা করছেন আমার জন্মভূমিকে—জনক-জননীকে, জায়া-নন্দনকে। নির্বাণের পথ তো পরম শান্তির পথ। চল।"

রাজ্যসীমা ছেড়ে চললেন তাঁরা। ক্রোড্য দেশ, মল্লদেশ ছেড়ে অনামার তীরে বেণুবনে এসে থামল কন্টক। সকাল হয়েছে। সিদ্ধার্থ ঘোড়া থেকে নীচে নেমে রত্ন আভরণ খুলে ফেললেন শরীর থেকে, বললেন—"ছন্দক, এ অশ্ব মম, এই আভরণ লয়ে ফিরে যাও গৃহে।"

এতক্ষণ পরে ছন্দক গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল। বহু কষ্টে তাকে শান্ত করলেন কুমার। সন্ন্যাসীর বেশ পরতে হবে।

দেখলেন একজন ব্যাধ যাচ্ছে। মলিন ছিন্ন বসন দেখে সিদ্ধার্থ ব্যাধকে ডাকলেন। নিজের মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ তার মলিন বসনের সঙ্গে বদলে নিয়ে পরলেন ব্যাধের পোষাক। ব্যাধ চলে গেল। এইবার তরবারি দিয়ে ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশদাম কেটে ফেললেন কুমার।

ছন্দক দুই হাতে মুখ ঢেকে রইল। কণ্টকের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তারপর সিদ্ধার্থ আদেশ করলেন তাদের ফিরে যেতে। বলে নিজেই চলতে আরম্ভ করলেন সম্মুখের দিকে। যতদূর দেখা গেল ছন্দক সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে রইল।

আর—"অদৃশ্য হইলে পড়িয়া ভূতলে
কণ্টক ত্যজিল প্রভু-বিরহে জীবন।"

* * *

কপিলবস্তুতে রাত্রি প্রভাত হ'ল।

কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আবার আর্তনাদ করে উঠলেন গোপা—"কুমার, কুমার, কোথায় তুমি, কোথায় তুমি ?"

এই আর্তস্বরে ঘুম ভেঙে গেল সবার। দাসদাসী ছুটে এল। সখীরা এল ছুটে; গৌতমী এলেন। "কুমার কই, কোথায় কুমার ?" চারিদিকে খোঁজ পড়ে গেল। চারিদিকে ছুটে চলল রক্ষী, প্রহরী, সৈন্যসামন্ত। কেবল নীরব, নিস্পন্দ হয়ে ঘরে বসে রইলেন বৃদ্ধ রাজা শুদ্ধোদন।

এমন সময় ছন্দক এল কুমারের আভরণ নিয়ে। কুমার সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।

সপ্ত দিবা নিশি মাতা প্রজাবতী
মূর্ছিতা ধরা-শায়িতা
সপ্ত দিবা নিশি গোপা অভাগিনী
মূর্ছিতা ধূলিলুণ্ঠিতা।
সপ্ত দিবা নিশি বৃদ্ধ নরপতি
নীরব নিশ্চল স্থির ;
নিদ্রিত জাগ্রত কেহ নাহি জানে
নেত্রে নাই বিন্দু নীর।

রাণী আকুল ভাবে কাঁদতে লাগলেন। রাণী রাজাকে বললেন—"চলো মহারাজ, এই রাজপুরী শ্মশান, এখানে থাকব না আমরা, আমরাও বনে যাই।"

রাজা সজল-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—"রাজপুরী নয় রাণী, শ্মশান হয়েছে হৃদয়, বনে গিয়ে শান্তি পাবে কেন? তুমি বোঝ নি, কিন্তু আমি জানতাম। কুমার তোমার আমার নয়—সে জগতের। জগৎকে দুঃখ থেকে বাঁচাতে সে আমাদের দুঃখ দিয়ে গেছে। এ দুঃখ আমরা সইব, সগৌরবে বহন করব। আমরা অপেক্ষা করব, যেদিন জগতের মুক্তিদাতা হয়ে তোমার গৌতম ঘরে আসবে। সেই দিনটির জন্য দুঃখ বহন কর, মুছে ফেল চোখের জল ; গোপা মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াও।"

গোপা উঠে বসলেন ধীরে ধীরে। ছন্দকের কাছ থেকে পাওয়া আভরণ কুমারের সিংহাসনের উপর রেখে, বিলাস-গৃহকে দেবমন্দিরে পরিণত করলেন। নিজেকেও বদলে ফেললেন গোপা। আভরণ পরিচ্ছদ খুলে ফেলে, দীর্ঘ কৃষ্ণ কুন্তল কেটে ফেলে, গেরুয়া বসন পরে সন্ন্যাসিনী সাজলেন।

গোপার এই বেশ দেখে কেঁদে আকুল হয়ে উঠলেন রাণী।

তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—"মা, তুইও কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবি ?"

গোপা শাশুড়ীকে প্রণাম করে বললেন—"না মা, আমি কোথাও যাব না। সন্ন্যাসীর স্ত্রী আমি—সন্ন্যাসিনী। আমিও সন্ন্যাস সাধনা-ই করব।"

"বনে বনে গিয়া কঠোর সন্ন্যাস
সাধিবেন মম স্বামী !
বিলাস-ভবনে এই বেদীমূলে
সাধিব সন্ন্যাস আমি ॥"

* * * *

ভিখারীর বেশে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে হেঁটে চললেন নবীন সন্ন্যাসী—অনিশ্চিত মনে। কঙ্কর, প্রস্তরের আঘাতে পা ক্ষত-বিক্ষত হ'ল, গা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল দরদর করে।

ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। কেবল ভাবনা—বোধি আসবে কবে, কবে লাভ করবেন নির্বাণ।

পথে কয়েকটি আশ্রমে আশ্রয় নিয়ে বৈশালীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সর্বশাস্ত্র ও সর্ব দর্শনে পারঙ্গম ঋষি আরাড় কালামের শিষ্যত্ব নিয়ে তাঁর কাছে সর্ব দর্শন পাঠ করলেন সিদ্ধার্থ, কিন্তু জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর হাত থেকে দর্শন কি মানুষকে বাঁচাতে পারে? বৈশালী ত্যাগ করলেন কুমার।

ভাগীরথী পার হ'য়ে রাজগৃহে আশ্রয় নিলেন তিনি। জরাসন্ধের প্রাচীন রাজধানী গিরিব্রজপুরের ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে মহাকালের শক্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন কুমার। ঘুরে ঘুরে দেখলেন—গিরিব্রজপুরের ধ্বংসস্তূপ আর রাজাদের বিপুল ঐশ্বর্য। রূপবান্ নবীন সন্ন্যাসীকে দেখতে পথে পথে লোকের ভিড় লেগে গেল। রাজা বিম্বিসার এই অনিন্দ্যসুন্দর যুবককে দেখে মুগ্ধ হলেন।

অপরাহ্ণে যখন পাণ্ডবশৈলে সিদ্ধার্থ বসে আছেন—বিম্বিসার তখন তাঁকে দেখতে এলেন। রাজা বললেন—"যোগিন্, তুমি যুবক, কেন যৌবনে এই কঠিন পথ নিয়েছ? তুমি এস, আমার রাজ্যে এসে রাজভোগ গ্রহণ কর। তুমি নিশ্চয় কোন রাজপুত্র। তোমাকে সন্ন্যাস মানায় না।"

সিদ্ধার্থ হেসে বললেন—"মহারাজ, আপনার অনুমান সত্য। আমি রাজপুত্র—পিতামাতা, পত্নীপুত্র সব ছেড়ে, রাজ্য রাজভোগ ছেড়ে, এই পথে—কঠিন পথে এসেছি কেন? ঘরে শান্তি থাকলে বনে কে যায়?

নরনাথ সুধা যদি ফলে গৃহশাখে
কে যায় খুঁজিতে তাহা বন-বনান্তরে ?
নাহি কামে সুখ ভূপ, বৃক্ষফল মত
হায় কাম বৃন্তচ্যুত, অস্পৃশ্য, গলিত।"

বিম্বিসার মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন—"প্রভু, যদি কোন দিন সুধা লাভ করেন, সে প্রসাদ থেকে যেন আমি বঞ্চিত না হই!"

পাণ্ডবশৈলে থাকলেন কিছুদিন কুমার। রুদ্রকের কাছে যোগ শিক্ষা করলেন। কিন্তু নির্বাণ কোথায়, বোধি কতদূর ? না, অন্য পথে যেতে হবে। শেষে পাঁচজন শিষ্য নিয়ে পুণ্যতীর্থ গয়াধামে চললেন।

ফল্গু নদীর তীরে পর্বতবন-শোভিত গয়া কুমারের খুব ভাল লাগল। দিনের পর দিন তিনি সেখানে বাস করতে লাগলেন। কোন্ পথে পাওয়া যাবে মুক্তি, জন্ম-ব্যাধি জরা-মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ ? শেষে একদিন স্থির সংকল্প নিয়ে তৃণাসন পেতে ধ্যানে বসলেন তিনি। এক-দুই করে ছয় বৎসর ধ্যানে রইলেন। অনাহারে, অযত্নে শরীর কৃশ হ'য়ে গেল। একটি বদরী, কয়েক কণা তণ্ডুল খেয়ে কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়লেন। আর কয়েকদিন এই ভাবে থাকলে দেহ আর প্রাণকে ধারণ করতে পারবে না।

এমন সময়ে শাক্যসিংহের চোখের সামনে একটি দিব্যনারী ফুটে উঠলেন। নারীর দুই চোখে জল। নারী বললেন— "হা পুত্র, এ কি করলে তুমি? যে বুদ্ধত্ব লাভ করবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলে, আজ তা না লাভ করেই বনের ফুলের মত শুকিয়ে যাবে?"

সিদ্ধার্থ অবাক হ'লেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"কে তুমি মা, আমি তো তোমাকে দেখি নি।"

নারী বললেন—"পুত্র, আমি তোমার জননী মহামায়া। তোমার এই ব্যর্থতা, এই অর্থহীন সাধনা—আমাকে আকুল করছে। তুমি কি বুদ্ধত্ব লাভ করবে না?"

সিদ্ধার্থ বললেন—"নিশ্চয় লাভ করব, মা। তুমি আশীর্বাদ কর।"

নারীমূর্তি শূন্যে মিলিয়ে গেল।

সিদ্ধার্থের মনে গৃহের স্মৃতি ফিরে এল। শরীর পঙ্গু, এক পা চলবার শক্তি নেই তাঁর—কিন্তু মন ছুটে গেল কপিলবস্তুর প্রাসাদে। তাঁর পিতামাতা, তাঁর গোপা, তাঁর পুত্র—রাজবৈভব, পরিবার পরিজন এসব ফেলে—কোন্ মিথ্যার পেছনে ছুটে চলেছেন তিনি। তাঁরা কি আজও বেঁচে আছেন? আর কি সেখানে গিয়ে দাঁড়াবেন সিদ্ধার্থ নত শিরে। ব্যর্থ সাধনার লজ্জা নিয়ে? নির্বাণ কি মানুষের আয়ত্তে আসতে পারে? যদি এত

করেও নির্বাণ লাভ না হয়, মৃত্যুই হয়, তবে কেন বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে ?

সিদ্ধার্থের মনে কামনা এল। সঙ্গে সঙ্গে কামদেবতা মার তাঁকে আক্রমণ করলেন। পঞ্চশরের পাঁচটি বাণ থেকে পরমা সুন্দরী পাঁচটি কন্যা জন্মাল। জন্মেই তারা নানা প্রলোভন সুরা, সঙ্গীত, নৃত্য—নিয়ে ঘিরে দাঁড়াল সিদ্ধার্থকে। কামদেবতা নিজে বললেন—"শাক্যসিংহ, মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভোগ-রাশি এনেছি, গ্রহণ কর। এই তপস্যার পথ ত্যাগ কর।

এই নির্বাণের পথ দেখিছ কি দুঃখ রেখা ?
যাও ঘরে, কর পরিহার।"

এতক্ষণ যেন সিদ্ধার্থ ভেলকি বাজী দেখছিলেন, এবার স্মৃতি ফিরে পেলেন। বললেন—"মার, তোমাকে চিনেছি। সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, যশঃ, গৌরব, বিলাস—তোমার এই পঞ্চমারকেও দেখলাম। তোমার ছলনায় আমি ভুলব না, তুমি দূর হও।" বলতে বলতেই সিদ্ধার্থের দেহে সংযমের আগুন জ্বলে উঠল, আর তাতে সপরিকর কাম ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

কাম গেল বটে কিন্তু আর একটি মূর্তি এগিয়ে এল কাছে।

"দেখিলেন শাক্যসিংহ
দাঁড়ায়ে অদূরে এক মূর্তি বিভীষণ
শরীর কঙ্কাল সার, লেলিহান মহাজিহ্বা
আসিছে গ্রাসিতে যেন বিস্তারি বদন।"

সিদ্ধার্থ চিনলেন, এ মৃত্যু। স্থির হ'য়ে বসে তিনি বললেন —"দূর হও তুমি। তোমাকে আমি জয় করব।"

কহে মৃত্যু ঘোর কণ্ঠে—"পারিবে না শাক্যসিংহ
দুইদিন পরে আমি আসিব আবার।"

মৃত্যু অন্তর্হিত হল, কিন্তু তার কথাটি বাজতে লাগল সিদ্ধার্থের কানে। "আসিব আবার—আসিব আবার"—মৃত্যু আবার আসবে। এই দুর্বল দেহে প্রাণকে ধরে রাখব কি দিয়ে! দেহ-যন্ত্র যে ভেঙে পড়ছে। কি করব? কি উপায়?

হঠাৎ তাঁর সামনে ফুটে উঠল একটা ত্রিতন্ত্রী বীণা। একটা তার সে যন্ত্রটির ঢিলা হ'য়ে গেছে—সে তারে সুর উঠল না। আবার আর একটি তার খুব টানতে গিয়ে ছিঁড়ে গেল। তৃতীয় তারটি বাঁধা হ'ল ভাল করে। তাতে বিচিত্র সুর উঠল। বীণাটি হাতে করে এসেছিলেন দেবরাজ ইন্দ্র। দেবরাজ অন্তর্হিত হ'লেন। শাক্যসিংহ বুঝতে পারলেন বীণার ইঙ্গিত। দেহ হচ্ছে তার। বিলাসে যদি এ তার ঢিলা হ'য়ে যায় তবে তাতে নির্বাণের সুর বাজে না। আবার কঠোর তপস্যার টানে যদি ছিঁড়ে যায় দেহতন্ত্রী, তাতেও নির্বাণের সুর উঠে না। দেহ-তার ভাল ভাবে বাঁধতে হবে—সবল সমর্থ করতে হবে দেহকে।

ছয় বৎসর পর সিদ্ধার্থ বাইরে এলেন। উঠলেন আসন

থেকে। সুন্দর প্রভাত। নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন তিনি। পঞ্চ শিষ্য কবে চলে গেছেন। একা, অসহায় সিদ্ধার্থ বহুকষ্টে নৈরঞ্জনা নদীতে নেমে ছয় বৎসর পর প্রাণ ভরে স্নান করলেন। নদীর তীরে শ্মশান। সেখানে শবের একখানা বস্ত্র পরে একটা গাছের নীচে সিদ্ধার্থ বসলেন। নৈরঞ্জনার জলে প্রভাতের আলো নৃত্য করছে।

এমন সময় একটি তরুণী স্বর্ণপাত্রে পায়সান্ন মাথায় করে বনদেবতাকে নিবেদন করতে এল। মেয়েটি নান্দিকপতির কন্যা সুজাতা। অনিন্দ্যসুন্দর শুচিস্নাত তপঃকৃশ সিদ্ধার্থকে দেখে সুজাতা মনে করল—এই বনদেবতা।

"পায়সান্ন পদাম্বুজে দিয়া উপহার
কহে করযোড়ে বামা—'করিল মানস
পায়সান্নে বনদেব পূজিবে এ দাসী।
সিদ্ধ তার মনোরথ। দাসীর এ পূজা
কৃপা করি বনদেব করুন গ্রহণ'।"

সিদ্ধার্থ বললেন—"সাধ্বি, আমি বনদেবতা নই, তপস্বী, ক্ষুধার্ত। তোমার অন্ন সাদরে গ্রহণ করলাম, আশীর্বাদ করি তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক।"

সুজাতার পায়সান্ন খেয়ে সিদ্ধার্থ বল সঞ্চয় করলেন, তারপর কিছুদিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করে ধীরে ধীরে যোগক্ষম হ'লেন। সবল দেহ নিয়ে এবার মহাধ্যানে বসবার আয়োজন করলেন তিনি। মহাবৃক্ষ অশ্বত্থের নীচে আসন পাতলেন

তিনি। সাতবার বনস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে বীরাসনে জীবনের শ্রেষ্ঠ সিদ্ধির জন্য ধ্যানে বসলেন। মনে মনে সংকল্প করলেন—

"শরীর হউক শুষ্ক, অস্থি মাংস লয় ;
যাবৎ নির্বাণ জ্ঞান না হয় উদয়,
এ শরীর এ আসন রহিবে নিশ্চয়।"

সমস্ত দিবস স্থির ধ্যানে অবসিত হল।

রাত্রি এল—বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি।

পাহাড়, নদী, সমগ্র বনভূমি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল পূর্ণচন্দ্রের রূপালী জ্যোৎস্নায়...সিদ্ধার্থের মনের আকাশেও বোধি চাঁদের উদয় হ'ল। অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়ে গেল দিব্য জ্ঞানের আলোকে...তিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দেখলেন। প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের দুঃখের মূল ও তার সর্বনাশা পরিণাম। দেখলেন—দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ কর্মফল ; কর্মফলের কারণ চেষ্টা, চেষ্টার কারণ সুখতৃষ্ণা, সুখতৃষ্ণার কারণ সুখ-দুঃখ বোধ, সুখদুঃখ-বোধের কারণ ইন্দ্রিয়গণ ; ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সঙ্গে জগতের সংযোগ হচ্ছে এর কারণ, সংযোগের কারণ জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ, তার কারণ নানা জ্ঞান বা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণ অবিদ্যা। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশ হ'লেই নির্বাণ—সর্ব দুঃখের অবসান।

পাপ কর্মফলে জন্ম হইবে না আর ;
জরা-ব্যাধি-মরণের হইবে নির্বাণ।

বোধি লাভ করে সিদ্ধার্থ এতদিনে বুদ্ধ হ'লেন।

"কত সাধনায় হায় কত তপস্যায়
নির্বাণের পূর্ণ বুদ্ধি আয়ত্ত তাঁহার—
সিদ্ধার্থ সিদ্ধার্থ আজি, বুদ্ধ অবতার,
সে অশ্বত্থ বোধিদ্রুম।"

* * *

সাতদিন বুদ্ধদেব আপন আনন্দে বিভোর হ'য়ে রইলেন। একে একে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। তখন তিনি ভাবলেন—"এ কি আনন্দে আছি আমি। মানুষের দুঃখ দূর করব, নির্বাণের পথ দেখাব বলে সংসার ছেড়েছিলাম। আজ নির্বাণ লাভ করে একা তা ভোগ করব কেন?" উঠে দাঁড়ালেন বুদ্ধদেব। কিন্তু কার কাছে প্রচার করবেন এ ধর্ম। পাঁচজন শিষ্য ছিল, তারা আজ কোথায় আছে কে জানে? বুদ্ধদেব ধ্যানে বসলেন। দেখলেন তাঁর শিষ্যরা কাশীতে মৃগদাবে (সারনাথ) আছে। দীর্ঘ ছয় বৎসর পর নৈরঞ্জনা নদী ত্যাগ করে বুদ্ধদেব চললেন কাশীর দিকে।

ভারতের মহাতীর্থ কাশী। বুদ্ধদেব কাশী থেকে মৃগদাবে এলেন। প্রথম তাঁর শিষ্যদের সন্দেহ হ'ল হয়ত ব্রতভঙ্গ করে ব্যর্থ হয়ে শাক্যসিংহ কাশীর দিকে এসেছেন। কিন্তু

অমিতাভ বুদ্ধ

ধ্যানী বুদ্ধ

"আসিলে নিকটে বুদ্ধ মহিমামণ্ডিত
দেখি সেই শান্ত মূর্তি, করুণ নয়ন
জ্ঞানদীপ্ত নিরখিয়া, কহি এক স্বরে—
'গুরুদেব, গুরুদেব'—হইল প্রণত।"

পাঁচজন শিষ্যকে শিক্ষা দিয়ে বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। তার পর থেকে দলে দলে হাজারে হাজারে নরনারী সত্যধর্মের আশ্রয় নিতে লাগল। বর্ষাশেষে বহু শিষ্যে পরিবৃত হ'য়ে তিনি মগধে যাত্রা করলেন।

পথে গয়ায় দার্শনিক পণ্ডিত কাশ্যপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। কাশ্যপ অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁকে নানা যুক্তি দিয়ে এ যজ্ঞের ব্যর্থতার কথা বোঝালেন।

"ইন্দ্রিয়ে না যোগাইলে বিষয়-ইন্ধন
কামনার দাবানল হয় নির্বাপিত
কাশ্যপ, মনের শান্তি লভে অবিচল ;
কামনা নির্বাণে হয় দুঃখের নির্বাণ।"

কাশ্যপ দীক্ষিত হলেন। মগধের রাজগৃহে এলেন বুদ্ধদেব। যষ্টি বনে মহারাজ বিম্বিসার তাঁর চরণে আশ্রয় নিলেন।

"মগধ সাম্রাজ্য গর্ভে হইল স্থাপিত
বৌদ্ধধর্ম মহাধ্বজা, উড়িল আকাশে
বৌদ্ধধর্ম বৈজয়ন্তী ঝলসি গগন।"

* * *
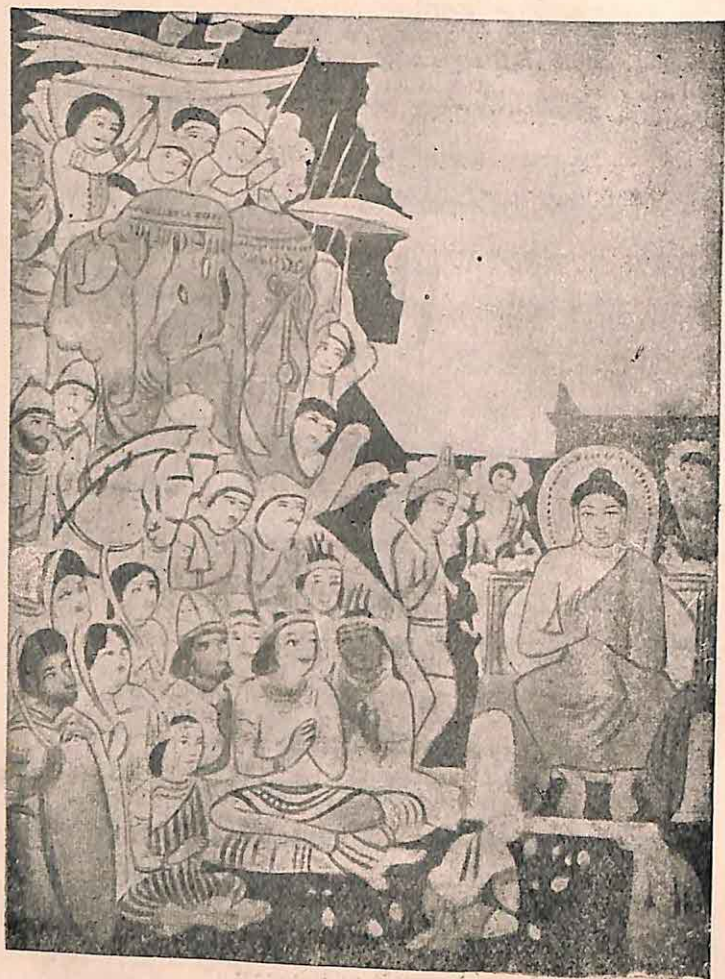
বুদ্ধদেব শিষ্যদের ধর্মোপদেশ দিতেছেন—অজন্তার চিত্র

একদা বুদ্ধদেব বেণুবনে বসে উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমন সময় কপিলবস্তু থেকে এল তাঁর এক বাল্যবন্ধু। এসে আনত হ'য়ে বলল—"মাতৃভূমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছে প্রভু, কোন্ দোষে দোষী তোমার পিতামাতা? তুমি চল—দেশে চল—

আকুল সে শাক্যরাজ্য, আকুল কপিলবস্তু
আকুল জননী তব, জনক আকুল;
আকুল গোপার প্রাণ পাইতে সে ধর্ম সুধা
সোনার পুতুল শিশু আকুল রাহুল।"

বসন্তকাল এল। বুদ্ধদেব শিষ্যদের নিয়ে কপিলবস্তু এলেন। নগর বাহিরে বস্ত্রাবাস ফেলে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরুলেন ভিক্ষা করতে। রাজকুমার ভিখারী—! কেউ ঘরে ছুটে গেল, কেউ সর্বস্ব ফেলে দিল ভিক্ষাপাত্রে। কপিলবস্তুর নরনারীর চোখের জলে পূর্ণ হল ভিক্ষাপাত্র, ভিজে গেল পথঘাট।

বুদ্ধদেব রাজার দুয়ারে এলেন। পিতা শুদ্ধোদন সাগ্রহে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পুত্রকে ভিক্ষা করতে দেখে তাঁর চোখে জল এসে পড়ল,—তিনি বললেন—"তোমার সহচর ভিক্ষুদের আমি কি খাদ্য পানীয় দিতে পারতাম না বাবা, ভিক্ষা কেন?"

বুদ্ধদেব বললেন—"আমরা ভিক্ষু, সন্ন্যাসী—এই ভিক্ষাই যে আমাদের বৃত্তি, মহারাজ।"

রাজা বুদ্ধদেবকে নিয়ে অন্দরে এলেন। রাণীর দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন সন্ন্যাসী—"মা, ভিক্ষা দাও।"

রাণী প্রজাবতী ভিক্ষা নিয়ে বেরুলেন। কে এ সন্ন্যাসী? সিদ্ধার্থ? তাঁর গৌতম। রাণী আর্তনাদ করে মূর্ছিতা হ'য়ে পড়লেন। বুদ্ধদেব মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকতে লাগলেন—"মা—মা।" মা ডাকে জেগে উঠলেন প্রজাবতী। চোখ মেলে দেখলেন সিদ্ধার্থকে—চীৎকার করে উঠলেন রাণী—

"মহারাজ মহারাজ", বলিয়া বিবশা রাণী
"আমার সিদ্ধার্থ এ যে, এ ত দেব নয়।
ফেলে দাও ভিক্ষাপাত্র, আন রাজ-আভরণ
তাহার এ বেশে মম বিদরে হৃদয়।"

রাজা শান্ত করলেন রাণীকে। বললেন—"রাণী, পৃথিবীতে এমন রাজকোষ নেই যার সঙ্গে এই ভিক্ষাপাত্র বদল করা চলে। ছেলে তোমার নির্বাণধন এনেছে—গ্রহণ কর, চেয়ে নাও।" বুদ্ধদেবকে বললেন—

"লইয়াছি ভিক্ষাপাত্র, ভিক্ষাপাত্র লও তুমি—
সিদ্ধার্থ, তোমার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতামাতা
মাগে এই ভিক্ষাপাত্র, কাটিয়া মায়ার পাশ
দেও ভিক্ষাপাত্র! পুত্র, হও পরিত্রাতা।"

বুদ্ধদেব বললেন—"দিলাম, কিন্তু পিতা তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, রাজসিংহাসনে বসেই তুমি সন্ন্যাস পালন করবে।"

গোপা নিজের ঘরে বসেছিলেন—ধ্যানমগ্না যোগিনী। সখীরা গিয়ে বললে—"গোপা, কুমার এসেছেন, চল প্রণাম করবে।"

"না সখি"—কহিলা গোপা—অধরে আনন্দ হাসি,
"সফল যদি এ দীর্ঘ তপস্যা আমার,
আমার হৃদয়নাথ আসিবেন এইখানে
. এইখানে পদাম্বুজ পূজিব তাঁহার।"

দুইজন শিষ্য নিয়ে বুদ্ধদেব গোপার মন্দিরে এলেন। বিলাস-ভবন—আজ মন্দির হয়েছে। পরণে গৈরিক বসন, শিরে জটা-ভার—যোগিনী গোপা নিস্পন্দ হ'য়ে পায়ের নীচে পড়ে রইলেন।

আট বছরের পুত্র রাহুল। গোপা তাকে বললেন—"রাহুল, পিতার কাছে মাগ গিয়া পিতৃধন।"

রাহুল বলল—"কে আমার পিতা মা?"

গোপা বুদ্ধদেবকে দেখিয়ে দিলেন।

রাহুলকে কোলে ক'রে বুদ্ধদেবের পদতলে বসলেন গোপা। রাহুল বলল—"দাও পিতঃ, পিতৃধন।"

সকলে হাহাকার ক'রে উঠল।

"দিব পিতৃধন বৎস, পালিব পিতার ধর্ম,
দিব সপ্তরত্ন"—বুদ্ধ কহিলা গম্ভীরে…
"সারিপুত্র, ভিক্ষাপাত্র"—আজ্ঞামাত্র দিল শিষ্য
পত্নীপুত্র-করে পাত্র ভাসি অশ্রুনীরে।

এবার এল বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ। বুদ্ধদেবের পায়ের নীচে পড়ে বলল—"আমাকে ভ্রাতৃধনে অধিকার দাও।"

বুদ্ধদেব বললেন—"দিলাম। কিন্তু যতদিন বাবা-মা বেঁচে আছেন, ততদিন—'রহিবে নিকটে তুমি পালিবে পুত্রের ধর্ম'।"

নন্দ রাজী হ'ল না এই কথায়। বুদ্ধের চরণ-সেবা তার শ্রেষ্ঠ সাধ। তখন বুদ্ধদেব গোপার দিকে তাকালেন। ধীরে ধীরে বললেন—"গোপা, বাবা-মায়ের সেবার ভার তোমার। তাঁরা যতদিন বেঁচে থাকবেন, তুমি ততদিন এইখানে থেকো।"

গোপা নীরবে সম্মতি জানালেন এবং সজল চক্ষে পুত্রকে চুমো দিয়ে বিদায় দিলেন। বললেন—

"যাও বৎস প্রাণাধিক, যাও জনকের সনে
পুণ্যের পশ্চাতে যেন সুখ নিরমল ;
পতি যার নারায়ণ, পুত্র মাগো দেবশিশু
সিদ্ধ তার নারীজন্ম, তপস্যার ফল ॥"

রাহুল ও নন্দকে নিয়ে বুদ্ধদেব রাজপুরী ত্যাগ করলেন। রাজপুরী শ্মশান হ'ল।

"বন্যার কল্লোলমত ব্যাপিয়া বিশাল পুরী
ব্যাপিয়া কপিলবস্তু উঠিল রোদন।"

কয়েকদিন পর বুদ্ধদেব চলে গেলেন কৌশাম্বী।

কৌশাম্বীতে খবর এল শুদ্ধোদন অসুস্থ। ছুটে কপিলবস্তুতে এলেন বুদ্ধদেব, রুগ্ন পিতার শিয়রে দাঁড়ালেন, পুত্ররূপী নারায়ণকে

দেখতে দেখতে প্রাণত্যাগ করলেন রাজা। শাক্যকুল অনাথ হ'ল। তখন বুদ্ধদেব এক সন্ন্যাসিনী-সংঘ গঠন করলেন। গোপাকে তার নেত্রী ক'রে কৌশাম্বীতে চলে গেলেন এবং

নির্জনে কৌশাম্বী শৃঙ্গে : শান্তিময় স্থানে হইলা সমাধিমগ্ন।

*   *   *

কৌশাম্বীর পথে একনালা গ্রামে ভরদ্বাজ নামে এক ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন—"ভিক্ষু, তুমি সবল পুরুষ, তুমি ভিক্ষা কর কেন?"

বুদ্ধদেব বললেন—"তুমি কি কর সৌম্য?"

ভরদ্বাজ বললেন—"আমি চাষ করে খাই।"

বুদ্ধদেব বললেন—"আমিও চাষী।"

"চাষী!" ভরদ্বাজ বললেন—"তোমার হল, বীজ, বলদ কোথায়?"

"বিশ্বাস আমার বীজ"—বুদ্ধ উত্তরিলা—
"আমার শস্যের ক্ষেত্র মানব হৃদয়।
ধর্ম মম হল, জ্ঞান বলদ আমার,
নির্বাণ আমার শস্য অমর অক্ষয়।"

ভরদ্বাজের চোখের ভ্রান্তি দূর হল। হৃদয়-ক্ষেতে নির্বাণ ফসল ফলাবার জন্য তক্ষুনি শরণ নিলেন তথাগতের।

বুদ্ধ বিপুল উদ্যমে ধর্মপ্রচার করছেন।

শ্রাবস্তিপুরে শিষ্যদের নিয়ে একদিন তিনি বসে আছেন। এমন সময় কৃষ্ণাগৌতমী নামে এক নারী তার মৃত শিশুকে বুকে ক'রে এল আর্তনাদ করতে করতে। বুদ্ধের পায়ের তলে মৃতশিশুকে রেখে কৃষ্ণাগৌতমী বলল—"প্রভু, তুমি ভগবান, আমার পুত্রকে বাঁচিয়ে দাও। না দাও তো তোমার পায়ের নীচে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। বাঁচিয়ে দাও প্রভু, আমার একমাত্র পুত্রকে বাঁচাও, বাঁচাও..."

বুদ্ধদেব স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন—"উতলা হ'য়ো না মা। বাঁচাব তোমার পুত্রকে। বাঁচাব, যদি ওষুধ নিয়ে আসতে পার। পারবে তুমি?"

"পারব না?"—কৃষ্ণাগৌতমী উঠে দাঁড়াল—"সাপের মাথার মণি আনব প্রভু যদি আমার খোকা প্রাণ পায়। কি ওষুধ শুধু তাই বলো।"

বুদ্ধদেব বললেন—"এক মুষ্টি সরষে নিয়ে এস মা, তোমার পুত্রকে প্রাণ দেব আমি।

কিন্তু সরষে সে হ'তে আনিও কেবল,
যেই গৃহে কেহ মাতঃ মরেনি কখন।"

কৃষ্ণাগৌতমী ছুটে গেল পল্লীতে। "একটু সরষে দেবে গো—আমার ছেলের মৃত্যুঞ্জয় ওষুধ? দাও—দাও, শীগ্গির দাও। কিন্তু তোমাদের ঘরে কেউ মরেনি তো?"

—"হ্যাঁ বাছা, মরেছে। মরেছে বাবা, মা, ছেলে, মেয়ে..."

"তোমাদের ঘরে ?"

—হ্যাঁ। মরেছে·· বাবা, মা, ছেলেমেয়ে···

—তোমাদের ?

—হ্যাঁ। মরেছে ? মরে নি এমন ঠাঁই কোথায় জগতে ?

থমকে দাঁড়াল কৃষ্ণাগৌতমী। মরে নি এমন ঠাঁই কোথায় জগতে ? ঠিক-ই তো। মরণ তো নিশ্চিত, স্থির। পুত্র গেছে, সে-ও যাবে একদিন। জন্মে মরে না কে ? কৃষ্ণাগৌতমী ফিরে এল—শরণ নিল বুদ্ধের, মরজীবনে অমৃত-সন্ধানীর।

* * *

দিকে দিকে সদ্ধর্ম প্রচারিত হল। একাদিক্রমে চুয়াল্লিশ বছর বুদ্ধ নির্বাণের পথ দেখালেন মানুষকে। "আসমুদ্র হিমাচল বক্ষ ভারতের" নবধর্মের বন্যায় ভেসে গেল।

একদিন প্রিয়তম শিষ্য আনন্দকে ডেকে বললেন তথাগত— "আনন্দ, আমার যাবার সময় হয়েছে। জীর্ণ এই দেহ এবার আমি ত্যাগ করব।"

এই মর্মান্তিক সংবাদে শিষ্যরা কাঁদতে লাগলেন, বুদ্ধ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আমার দেহ আশীবছরের জরায় শীর্ণ হয়েছে, ব্যাধিতে জীর্ণ হবে, শেষে মৃত্যু একে ভক্ষণ করবে। এই তো প্রকৃতির শাশ্বত বিধান। আমার দেহের অবসান হবে, কিন্তু আমি তো থাকবই আমার সংঘের, আমার ধর্মের সঙ্গে মিশে চিরকাল। মনে রেখো—

জন্মিলেই মৃত্যু বৎস। ফুটে যদি ফুল
শুকাইবে ; জলবিম্ব উঠিলে মিলিবে।"

তথাগত কুশীনগরে চললেন।

বৈশালী থেকে কুশীনগর আসবার পথে পাওয়া গ্রাম। এইখানে চণ্ডের বনে তিনি বিশ্রাম নিলেন। চণ্ড ভক্ত। তথাগত ও ভিক্ষুদের জন্য সুখাদ্য, সুপেয় ও শূকরের শুক্‌না মাংস নিয়ে এল ভিক্ষা দিতে। বুদ্ধদেব কারো কোন ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতেন না। যে যা দিত সানন্দে গ্রহণ করতেন। কিন্তু মাংস তিনি কখনও খেতেন না, কেউ দিতও না তাঁকে। চণ্ড তা জানেও না। তথাগত চণ্ডকে নিরাশ করলেন না। বললেন —"মাংস আমি খাচ্ছি, আর কাউকে দিও না।"

অনভ্যস্ত এই খাদ্য খেয়ে তথাগত আমাশয় রোগে পড়লেন। একটু সুস্থ হ'য়ে এলেন কুশীনগরে।

মহানির্বাণের মহাক্ষণ এল। এল বৈশাখী পূর্ণিমার পবিত্র রাত।

"বসন্তের পৌর্ণমাসী। নির্মল আকাশে
বসন্তের পূর্ণচন্দ্র। ভাসিতেছে ধরা
নিরমল সুশীতল চন্দ্রিকা সাগরে।"

ভিক্ষুগণকে একত্রিত করে বুদ্ধ তাঁর জীবনের শেষ উপদেশ দিলেন। চণ্ডের দেওয়া মাংস খেয়ে তাঁর মৃত্যু হ'ল

এই কথা পাছে কেউ বলে, এই আশঙ্কায় করুণাঘন বুদ্ধ বললেন—

"কহিও চণ্ডেরে—
সুজাতার অন্নে বুদ্ধ হইলাম আমি।
লভিলাম নিরবাণ অন্নেতে তাহার।
বড় পুণ্যবান চণ্ড।"

তারপর বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলি আর একবার ভাল ভাবে বুঝিয়ে তিনি বললেন—

"বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নে শরণ
লও ভিক্ষুগণ। লভ নিরবাণ আর
পশিয়া গহন বনে ভূধরে সাগরে
বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ কর নির্বাণ প্রচার।"

তথাগতের শেষ কথা উচ্চারিত হ'ল।

তারপর······

"নীরব পূর্ণিমা নিশি ; নিস্পন্দ নীরব
ঊর্ধ্বে পূর্ণচন্দ্র, নিম্নে সুপ্ত ধরাতল।
ফুরাইল শেষ কথা ; ধীরে বুদ্ধদেব
হইলা নীরব ; ধীরে মুদিলা নয়ন।"

আড়াই হাজার বছর আগে বৈশাখী পূর্ণিমার পুণ্যক্ষণে

বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ লাভ করলেন। বিশ্বের দিকে দিকে যুগ-যুগান্তকাল চিরন্তন হ'য়ে রইল শান্তি-মৈত্রী-প্রীতির বাণী। বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ ত্রিশরণের অমর, অমৃত, অক্ষয় ঘোষণা—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।